Vol. 45 | No. 2 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুক্তিযুদ্ধের না-বলা কথা : হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আলমগীর মিয়া
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.6
Pages	145-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুক্তিযুদ্ধের না-বলা কথা : হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প

আলমগীর মিয়া*

সাত'শ বছরের বিদেশী শাসনে বিজিত বাঙালি তার ক্ষত্রিয় সম্ভ্রম পুনরুদ্ধার করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। দুই'শ বছরের ইংরেজ শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতার প্রাপ্তি ঘটে– তাতে গৌরব নয় গ্লানিই অধিক। অর্জিত নয় প্রাপ্ত স্বাধীনতার মাধ্যমে আজকের বাংলাদেশ, পাকিস্তান নামক নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বলয়ে বন্দী হয়। চলতে থাকে পুরোনো শোষণ নূতন মোড়কে। ধর্মের ঘেরাটোপে বাঙালির ওপর চলতে থাকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ। প্রবল দ্রোহে জেগে ওঠে গোটা বাঙালি জাতি। ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ নয়– সমগ্রজাতির অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সকল শ্রেণী পেশার বাঙালি মিলিত হয় একটি বিন্দুতে। তাই এ যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়– মুক্তিযুদ্ধ। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণ ছিল এদেশের কৃষক এবং কৃষকের শিক্ষিত সন্তানদের। তাদের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সংঘটিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে। যুদ্ধের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সাফল্যের দখল চলে যায় বিত্তবান শ্রেণীর হাতে। মূলত নিম্নবর্গের রক্তের ওপর দিয়ে আগত যে বাংলাদেশ– নিম্নবর্গ সেখানে অনাহুত।

প্রকৃতজনরা সাফল্যের ফসল-হারা হলেও, অনাহুত হলেও হাজার বছরের বাঙালির প্রধান অর্জন এই স্বাধীনতা। ড. আনিসুজ্জামানের ভাষায় ...... 'সেই এক আশ্চর্য সময় এসেছিল আমাদের জীবনে আমাদের ইতিহাসে। এত সুসময় আর কখনো, এত দুঃসময় আর কখনো দেখিনি আমরা।'[১] বাঙালির সুসময় দুঃসময় অথবা এই আশ্চর্যময় সময়ের বিশেষ অভিধা 'মুক্তিযুদ্ধ'। গত তিন শতকে বাঙালি জাতির

* প্রভাষক, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

মতোই পৃথিবীর অসংখ্য জাতি অনুভব করেছে মুক্তির শিহরণ, স্বাধীনতার স্বাদ, বিজয়ের গৌরব। বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ভাষায় রচিত হয়েছে তাদের গৌরব গাঁথা। সে তুলনায় বাঙালি জাতি আজো আক্ষেপের স্তরেই রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনো রচিত হয়নি মহৎ ও মহাকাব্যিক কোনো উপন্যাস । কবিতা ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এসবের শরীর থেকে রিমোভার দিয়ে রোমান্টিকতার পেলব বিচ্ছিন্ন করলে শাঁস টিকে থাকে খুব কম। সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রূপায়ণে তুলনামূলক অর্থে ছোট গল্পই অধিকতর সার্থক। তবে স্বাধীনতার সামগ্রিক চরিত্রের 'মেঠো- তেতো' স্বাদের বদৌলতে মধ্যবিত্ত-মানসিকতার ভাবপ্রবণতাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ। এ পর্যায়ে অনুভব ও চেতনার রসায়নে শাঁসালো বাস্তবকে দ্রবীভূত করে হাসান আজিজুল হক (১৯৩৮–) বাংলা ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধকে অনেকটা স্বচ্ছ করে তুলেছেন। দার্শনিক, সামাজিক ও শ্রেণী সত্যকে স্বীকার করে আত্ম-আবেগের গভীর প্রান্ত থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে অবলোকন করেছেন ছোটগল্পে। তাঁর ভাষায় "যদি কোটি মানুষের শোক আমি একা আমার এই বুক থেকে খালাস করে দিতে পারতাম, যদি পুরো একটি আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে কষ্টের শোকের ক্ষোভের ক্রোধের আক্রোশের উচ্ছ্বাস আমার একার বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত, যদি লক্ষ মানুষের অশ্রু আমার দুখানি চোখ থেকে মুক্তি পেত, তাহলে হয়তো খানিকটা ন'মাসের অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যেত।"[২] হাসানের এই আবেগ স্ফটিক পাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে স্ফূরণ ঘটিয়েছে সত্যের। মুক্তিযুদ্ধের সিন্ধু বাস্তবতা ঝল্কে উঠেছে বিন্দুতে। "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ,

মুক্তিযুদ্ধের লাল টকটকে রক্তে স্নাত বাংলাদেশ– হাজার বছরের বাঙালির স্বপ্ন বাংলাদেশে যখন সত্যিই বাস্তবে রূপ পেতে থাকে মায়াহীন, স্বপ্নহীন বাস্তবের রুক্ষ কঠিন জমি থেকে তখন তার মধ্যেই দেখা দেয় যত্রতত্র চোরাবালি। ... মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া শরতের নির্মল ভোরের সূর্যের মতো রক্তে ডোবানো বাংলাদেশ কি বিজয়ের পরের দিন থেকেই পালাতে শুরু করেছিল?"[৩] এভাবে হাসান মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপটকে অতিক্রম করে ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে "প্রায় এক লাখ কুড়ি হাজার মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ছিলো ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩,০০০; ইপিআর-এর ১০,০০০ সৈন্য; এবং ১৩,০০০ পুলিশ। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধার সিংহভাগই ছিলো বেসামরিক মানুষ যাদের মধ্যে ছিলো ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ।"[৪] শোষণ, বঞ্চনা এবং জীবনাচরণের নানামাত্রিক আকাঙ্ক্ষা থেকে যুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল এইসব সাধারণ

মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের বিশালপটে এইসব সাধারণ মানুষের বীরত্বদীপ্ত অংশগ্রহণ ও আকাঙ্ক্ষাপতনের বেদনাদীর্ণ বয়ানের পাশাপাশি হাভাতে মধ্যবিত্তের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার নির্মম ইতিহাসও রূপায়িত হয়েছে হাসানের ছোটগল্পে। মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক সত্যের প্রকৃত স্বরূপটি টান টান রেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কেচে চিহ্নিত করেছেন হাসান। "মুক্তিযুদ্ধে যে বাংলাদেশের হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক আর নানা শ্রমজীবী মানুষ অংশ নিয়েছিল, সে কথাটা কিছুদিনের জন্য ভুলে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। মনে হতে পারত, হাঘরে শহুরে মধ্যবিত্তই বুঝি মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং তাদের বাড়ির খিদে, সম্পত্তির খিদে, লুটপাটের খিদে মেটানোই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র কাজ।"[৫]

মুক্তিযুদ্ধের গল্প আলোচনার আগে হাসানের দেশবিভাগ বিষয়ক গল্পগুলোতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়। কেবল মুক্তিযুদ্ধের গল্প নয়– যুদ্ধের ২৩ বছর পূর্ব ৪৭'-এর ঠুঁটো স্বাধীনতার মর্মবিদারী স্বাদ রূপায়ণেও হাসান আজিজুল হক একজন অগ্রগামী ও সফল নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। তাঁর ভাষায় "বিজয় শব্দে নয় গোঙানির আওয়াজ করে এসেছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা।. . . ম্যাড়মেড়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আলো কুষ্ঠের ক্ষতের উপরে খেলা করছে।" এই ক্ষতের যন্ত্রণাখচিত দর্পণ আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭) গ্রন্থের নামগল্প। দেশবিভাগের নির্মম ফল, স্বাধীনতার কটুস্বাদ রূপায়িত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র অ্যাজমা রোগী রুকুর পিতা ও তার আত্মজ রুকুর চরিত্রে। তারা 'এপার-ওপার' বাংলার দেশবিভাগজাত রক্ত ক্ষরণের প্রতীক। এই গ্রন্থের 'পরবাসী' গল্পের বশিরও একই ভাবে পাঠককে তীব্র নাড়া দেয়, যন্ত্রণায় দগ্ধ করে। প্রথম গ্রন্থের (সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য, ১৯৬৪) 'উত্তর বসন্ত' গল্পে শিকড় উন্মূলিত যে মধ্যবিত্ত– তারা দেশবিভাগের ফল। জীবন ঘষে আগুণ (১৯৭৩) গ্রন্থের 'খাঁচা' গল্পের অম্বুজাক্ষ ও তার পরিবার দেশবিভাগের সুদূর প্রসারী তীক্ষ্ণ বেদনাকে ধারণ করেছে। সংখ্যালঘু শ্রেণী এই বেদনাকে ধারণ করে স্বভিটা থেকে কিভাবে বিতাড়িত হচ্ছে তারই গল্প মা মেয়ের সংসার (১৯৯৭) গ্রন্থের 'ঘের'।

হাসানের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্পগ্রন্থ নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)। এছাড়া আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৯) গ্রন্থের নামগল্প ও 'মাটির তলার মাটি', রোদে যাবো (১৯৯৫) গ্রন্থের 'ঝড়', নবজাতক' ও 'নিশীত ঘোটকী' এবং মা-মেয়ের সংসার (১৯৯৭) গ্রন্থের 'সম্মেলন' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক।

একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা (১৯৯৫) গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধে হাসানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনবদ্য ইতিহাস। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় জীবন ঘষে আগুন গ্রন্থের রূপক গল্প 'শোণিত সেতু' ৬৯'-এর গণঅভ্যুত্থানে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির প্রতীক-বিশ্ব; মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকী পরিপ্রেক্ষিত। দুইটি ষাড়ের লড়াই, বিলের ধান রক্ষাকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের জাগরণ ও হাঁপানিতে মুমূর্ষু নিশানাথের বেঁচে ওঠার কাহিনী এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের আগাম খবরটিই যেন জানিয়ে দেয়। ষাড় মানিক এ গল্পে মুক্তিকামি বাঙালির প্রতীক, অবলা পাকিস্তানীদের প্রতীক, গ্রামের মানুষ বাংলাদেশের প্রতীক, নিশানাথ সম্মিলিত সংগ্রামের প্রভাবে ঘুমন্ত বাঙালির জেগে ওঠার প্রতীক। গল্পের দাড়িওয়ালা হানিফ বিশ্বাস, একাত্তরে যারা রাজাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাঁদের প্রতীক।

নামহীন গোত্রহীন গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভূষণের একদিন'। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের ঝিলিক দেওয়া রোদের লম্বা দুপুরের শেষ প্রান্তে পাকবাহিনীর গণহত্যার মর্মান্তিক প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পে আর এরই প্রসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধপর্বে বাংলাদেশের কৃষকদের যুদ্ধ সম্পর্কিত উপলব্ধি। এপ্রিলের দুপুরে ভূষণ দাস মল্লিক বাড়িতে বেড়া বাঁধার কাজের সময়ে উঠতি বয়সের তিনটি ছেলের হাতে বন্দুক দেখে। তারা কৃষক শ্রেণীরই সন্তান। তাদের নিকটই ভূষণ স্বাধীনতার কথা শোনে। যুদ্ধের কথা শোনে। কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

> ভূষণ কিছু কিছু গণ্ডগোলের কথা শুনেছিলো। ঢাকায় নাকি ভারি গোলমাল চলছে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছে। খুলনাতেও হাঙ্গামা চলছে। ভূষণ এসব শুনেছে মাত্র। গণ্ডগোল তো এদেশে লেগেই আছে– তেমনি কিছু হবে হয়তো। এই অসহ্য এক ঘেয়ে গ্রামে পঞ্চাশ বছর আগে যখন ভূষণ পৃথিবীতে এলো, তারপর থেকে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছে। এই কথা ভূষণ শুনতে পায়, কিন্তু সে নিজে থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নি। আমি তো কিছুই দেখতেছিনে– ভূষণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এলো, কি হয়েছে দেশের, এই বিল যেমনকার তেমনি রইছে, কেডা এই বিলের মালিক ভগোমান জানে। বাবাও যা করতো আমিও তাই করছি– খালের ধারে এই জাম গাছটা পর্যন্ত যেমনি তেমনি রইছে। (পৃ. ১১/১৩)।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে ভূষণের এই সরল বিবেচনা এদেশের কৃষকের বিবেচনা। ছয় দফা, ১১ দফা, গণঅভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলন এসবের কথা গ্রামের কৃষক শোনে কিন্তু জানে না। তাদের জানানো হয় না। উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে বেচেঁ থাকার লড়াই করতে করতেই এক একটা প্রজন্ম কবরে সেঁধোয়। তাই স্বাধীনতা, জাতিসত্ত্বার অধিকার এসব তাদের নিকট খুবই অস্পষ্ট। কিন্তু এসব গণ্ডগোলের তীব্রতা তাদের বুঝতে হয় বড়ই মর্মান্তিকভাবে। ভূষণ হাটে গিয়ে চাপা উত্তেজনা বোধ করে।

> রোদ তখনো ঝিকমিক করে বড়ো বড়ো গাছগুলোর মাথায়। আবার একটানা শব্দ উঠলো কট্ কট্ কট্ কট্। তখন ভূষণ দেখলো গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে। (পৃঃ ১৬)

হাসানের এই বর্ণনা গণহত্যার বর্ণনা। এভাবেই একাত্তরের গ্রীষ্মে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে অবোধ কৃষকশ্রেণী গণহত্যার শিকার হয়েছে। তাদের অপরিমিত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা।'ভূষণের একদিন' গল্পের মাধ্যমে হাসান জানান দিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নির্বিচার গণহত্যার শিকার হয়েছে প্রধানত নিম্নবর্গ। সবচেয়ে বেশি রক্ত প্রদান করেছে নিম্নবর্গ।

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মফস্বল শহরের এক ভুতুড়ে রাতে নামহীন গোত্রহীন লোকটির আগমন এবং বিচরণ সূত্রে ধরা পড়েছে সেই সময়ের বন্দী মানুষের ভয়াবহ স্পন্দনহীন জীবনের নীরব ছবি। যে পরিস্থিতি গল্পে অবয়ব পেয়েছে– তা গণহত্যার একাত্তর, ভয়াল নিস্তব্ধতার একাত্তর, নীরব আর্তনাদ আর শীতল নিষ্ঠুরতার দীর্ঘ অমানিশি। 'নামহীন গোত্রহীন' লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করলে চলচ্চিত্রের ভঙ্গিতে যে ছবি ফুটে উঠে তা গণহত্যার, নির্যাতনের।

'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পটিও গণহত্যা সম্পর্কিত। গ্রামের সরল মানুষদের কিউয়ে দাঁড় করিয়ে নির্বিকার হত্যা আর নারীর সম্ভ্রম হরণের মর্মস্পর্শী গল্প 'কৃষ্ণপক্ষের দিন।' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার কৌশলগত পিছু হটার ঘটনা। পাঁচজনের একজন কিশোর একরাম, জামিল, মতিয়ুর ও শহীদ মধ্যবিত্ত আর রহমান ক্ষেতমজুর। রহমান ক্ষেতমজুর– কিন্তু রহমানই শারীরিক ও আন্তরিকভাবে এ গল্পে লড়াইয়ের শৌর্যবীর্যকে ধারণ করেছে। রহমানের "শরীরের হাড়গুলো চওড়া আর

চামড়া মোষের মত খসখসে"? পাক-সেনারা যখন গ্রামের একজন নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটায় তখন এই চওড়া হাড়ের রহমান মধ্যবিত্তের মত কৌশল গ্রহণ করতে চায় না– সরল দ্রোহে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

"খানকির পুত- তোদের মাকে– অশ্রাব্য গালি রহমানের দাঁত যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে বেরিয়ে আসে, মওতের জন্য মুক্তিযুদ্ধে আইছি, বাঁচবার জন্য না-আমি মানি না যে বাঁচা লাগবই থু মারি মোর জীবনে-রহমান উঠে দাঁড়ালো।" (পৃঃ ৩৯)।

রহমানের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধে নিম্নবর্গের অংশগ্রহণের স্বরূপটি। আর এদের আকাঙ্ক্ষাটি রূপায়িত হয়েছে এই দলের নেতা জামিলের মধ্য দিয়ে–

দ্যাখো অনেকদিন পরে হাতে অস্ত্র তুলে নেবার একটাই সুযোগ পাওয়া গেছে। কে কিভাবে সেটা ব্যবহার করবে আমি জানি না। কাউকে এদেশের বুকের উপর বসিয়ে দেবার জন্যে আমরা লড়ছি না। আমরা মালিক বদলাতে চাই না। প্রথমে ধরো এই বীভৎস গণহত্যা আর লুঠতরাজ। আমরা এই শুয়ারের বাচ্ছাদের দেখাবো– ওদের দাঁত ভেঙে দেব। তারপর এই দেশে এই দেশের সমস্ত মানুষের হাতে যাবে (পৃ. ৪৫)।

এই জামিল শিক্ষিত– কিন্তু কৃষক শ্রেণীরই প্রতিনিধি। তার পিতা হাটে শাক-সবজি বেঁচতো। নূতন জামা পরার কোন ইতিহাস তার শৈশব-কৈশর জীবনে ছিল না। দিনের পর দিন চুলোয় হাঁড়ি জ্বলতো না। নিম্নবর্গের এই সংকট থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের শিক্ষিত সন্তানগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে। 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', গল্পে মুক্তিযুদ্ধের এই বৃহৎ সত্যটিই প্রকাশ পেয়েছে।

'আটক' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ের সাধারণ মানুষের অকারণ জীবনদান বিষয়ক গল্প। পাকসেনাদের আক্রমণ করছে মিত্রবাহিনী, কিন্তু এ আক্রমণে সাধারণ বাঙালিও মারা যাচ্ছে। "যে মানুষদের বাঁচানোর জন্য সৈন্যদের উপর বোমা ফেলা হয়, বোমার আঘাতে সেই সাধারণ মানুষকেই মরতে হচ্ছে– এই বৈপরীত্যের মীমাংসা কীভাবে সম্ভব! কে তাহলে শত্রু! তাহলে কি এটাই সত্য, যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত বলি হতে হয় সাধারণ মানুষকেই।"[৬] এরকম একটি বোধ, একটি অভিব্যক্তি, একটি প্রশ্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে 'আটক' গল্পে।

'ঘরগেরস্থি' গল্পের রামশরণ সপরিবারে ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে নিজ ভিটেয় ফিরছে। গত বছর এই সময়ে প্রাণের ভয়ে চার সন্তান নিজের স্ত্রীসহ নিজের সাজানো সংসার যুদ্ধের জিহ্বায় সপে দিয়ে 'ইন্ডেয়' চলে যায়। সেখানে 'নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে" একটি সন্তান হারিয়ে ফিরে এসেছে স্বাধীন দেশে। উঁচু বাঁধ পেরিয়ে সপরিবারে নিজের গ্রামে ঢুকতেই রামশরণের চক্ষু চড়কগাছ। 'গায়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। ঘর-বাড়ির অবশেষ কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিল। কালো মাটির ভাঙা-চোড়া ভিটে আধাপোড়া খুঁটি, তোবড়ানো এনামেলের বাটি, ভাঙা ঝুড়ি, ঝাঁটা, উনুনের পোড়ামাটি আর ছাই-" (পৃ.৬৭)। বোশেখ মাসের প্রচণ্ড রোদ আর হু হু হাওয়ার মধ্যে রামশরণ আর ভানুমতি দিন কাটিয়ে দেয়। রাত দশটার দিকে তাদের ছোট মেয়েটা, নাম অরুন্ধতী– "এমন সুন্দর নাম নিয়ে সে মরে গেলে কোন সাড়াশব্দ না করে"। রাত গভীর হয়। জমে যাওয়া অন্ধকারের বুক চিরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে ব্রাত্য বাঙালির স্বাধীনতার বোধ; রামশরণের অভিজ্ঞতা-জ্ঞাত জ্ঞানের মর্মবস্তু;

> স্বাধীন হইছি আমরা– ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গতবছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয়– নটা মাস শ্যাল কুকুরের মত কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইষ্টিশান, কাল জাহাজঘাট– রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনটা কি, আ? আমি খাতি পালাম না– ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে? রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো– ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি। আমি বলতিছি কি– স্বাধীন হইছি না কি হইছি আমি বোঝবো কেমন করে? আগে এট্টা ভিটে ছিলো, এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনটা কিসি (পৃঃ ৭১)।

পরের দিন বেলা নয়টার দিকে রামশরণ "তার পরিবারটিকে নিয়ে গুট গুট করে বাঁধ ধরে এগিয়ে গেল সে পিঁপড়ের সারির মতো। লঞ্চে যাবে না রামশরণ। লঞ্চ ধরে কোথাও যাবার নেই তার।" এভাবেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সোপান থেকে পিছলে পড়ে দেশের নিম্নবর্গ। রামশরণের ক্ষোভ তার ধূসর বর্ণের পোড়ো বাড়ির মতই মধ্যবিত্তের মসৃণ কোমল ভাবগদগদ স্বাধীনতার আভাকে ম্লান করে দেয়। আর তা হয়ে ওঠে স্বাধীনতার মৌলিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিতবহ বক্তব্য।

রামশরণ ছিলো শরণার্থী। কিন্তু হাসপাতালে আহত কৃষক মুক্তিযোদ্ধা আসফ আলী 'কেউ আসেনি' গল্পে প্রকাশ করেছে একই জাতের সরল ক্ষোভ।

> দ্যাশ স্বাধীন হলি কি হয়? কই কেউ তো এসে আমারে কলো না দ্যাশ স্বাধীন হইছে। কেউ তো কলো না এখন কি হবে? আসফ আলী সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিতে লাগলো (পৃঃ ৮০)।

'৭১-এ বিজয়ের আনন্দে সমগ্র জাতি উদ্‌বেল হয়ে পড়েছিল। মালা আর খেতাব জুটেছিল অনেকের। তারা মধ্যবিত্ত। কিন্তু আহত যুবক কৃষক আসফ আলীকে কেউ দেখতেও আসে নি। যুদ্ধপরবর্তী এই শ্রেণীবিভেদের সত্যটিই নির্মমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'কেউ আসে নি' গল্পে। যুদ্ধশেষে কৃষকযোদ্ধা গফুর, মৃত এবং অর্ধমৃত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ নিয়ে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে শহরের হাসপাতালে পৌঁছায়। অর্ধমৃত তিনজনের একজন ২০/২২ বছরের যুবক কৃষক আসফ আলী– গফুরের পাশের গ্রামের ছেলে। আসফ আলীর এক পা কাটা যায়। কেউ তাকে দেখতে আসে না। এক সময় মারা যায় আসফ। অপরিমাণ অভিমান সে রেখে যায়। গফুরের মনেও চোলাই হতে থাকে ভাবনা।

> তার নিজের তো কোনো জমি নেই। যুদ্ধের আগে সে কামলা খাটতো। এখন সে বাড়ি গিয়ে কি করবে। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল! এখন ধান কাটা শুরুর মানে কি? সে কি আবার গিয়ে কামলা খাটবে রাইফেল খাকি-টাকি ফেরৎ দিয়ে? নাকি অন্য ব্যবস্থা কিছু হবে। (পৃ. ৭৭)।

আসফকে হাসপাতালে রেখে শহরে যায় গফুর। সেখানে বিজয়ের আনন্দ। কিন্তু 'কেউ এসে তার সঙ্গে কোনো কথা বললো না, দু একজন কেমন ভয়ে ভয়ে তার পোষাক আর রাইফেলটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো। পয়সা গুণে নেবার সময় রেস্তরার মালিক তার দিকে একবারও তাকালো না'। আসফ আলীর মৃত্যুর পর গফুর শ্রেণী চেতনায় আরও প্রাজ্ঞ হয়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়ালো। স্বাধীনতা, জাতীয়বাদী চেতনা, মুক্তি, মানবতার কোনো কিছুই এখানে দুটো শ্রেণীর সীমানা অতিক্রম করে নি। কেন্দ্র এবং প্রান্ত তারা যেন দুটো স্বতন্ত্র জাতি। যুদ্ধপরবর্তী এই অভিজ্ঞতারই ইঙ্গিত মেলে ' কেউ আসেনি' ও 'ফেরা' গল্পে।

'ফেরা' গল্পটি 'কেউ আসে নি' গল্পের প্রলম্বিত রূপ বা দ্বিতীয় পর্ব। এখানে গফুরের ভূমিকায় আলেফ গ্রামে ফিরেছে। আসফের স্থলে আমিন। আলেফ অর্থাৎ গফুরের মা, বউ এরাই গল্পের চরিত্র। আলেফ ভোর হবার আগেই বাড়ি ফেরে।

ভাতে অভাবী বউ বলে– "দ্যাশ স্বাধীন হইছে। আমাদের দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। ভাত-কাপড় পাবানি" ইত্যাদি। কিন্তু নয় মাসের যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে আলেফ, সরকারের ভাণ্ডারে অস্ত্র জমা দেয় না। বুকের ভেতর চেপে রাখে মুক্তির এক টুকরো আকাঙ্ক্ষা।

> রাইফেল হাতে বাড়ির পেছনে ডোবার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর গায়ে যত জোর আছে সব দিয়ে রাইফেলটা ডোবার মাঝখানে ছুঁড়ে দেয়।
>
> বাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আলেফ ভাবে, ডোবাটা ছোটো- রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না। (পৃ. ৯৪)

এ যুদ্ধের বিনিময়ে মুক্তি যদি না হয় তবে আর একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে– এরকম একটি বোধ নিয়ে জীবন শুরু করে আলেফ।

নামহীন গোত্রহীন গ্রন্থে ১৯৭১-এ এদেশের নিম্নবর্গ কিভাবে, কোন আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল, সিংহবৎ লড়াই করেছিল তার সমগ্রতার একটি রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এপ্রিলের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ব্রাত্য ভূষণ দাস বিস্ময় আর বিমূঢ় বোধ নিয়ে শিকার হয় গণহত্যার। অতঃপর 'নামহীন গোত্রহীন' মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে প্রবল আকাঙ্ক্ষাসমেত নিম্নবর্গীয় বাঙালি যুক্ত হয় সমরে। শ্বেত পক্ষের বদলে ফিরে আসে 'কৃষ্ণ পক্ষের দিন'। বাঙালি কাজল জাতি, কৃষ্ণজাতি। জলে ভেজা, রোদে পোড়া কালো জাতি টান টান উত্তেজনায় ঘুরে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্ত জামিলের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে কৃষক রহমান। দোর্দন্ড প্রতাপে নয় মাস যুদ্ধ করে বাঙালি- যার ৮০ ভাগ ছিল এদেশের কৃষক অথবা কৃষক সন্তান। বিজয়ের প্রাক মুহূর্তেও 'আটক' অবস্থায় প্রাণ দেয় সাধারণ বাঙালি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে পাকিস্তানবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের অপতৎপরতার শিকার হয়ে 'ঘরগেরস্থি' ত্যাগ করে এদেশের রামশরণ শ্রেণী শরণার্থী হয় ভারতে। শ্যাল কুকুরের মত জীবন বাঁচিয়ে তারা ফিরে আসে মুক্ত বাংলায়; পুরানো 'ঘর-গেরস্থি'র আঙ্গিনায়। কিন্তু চারদিকে কেবল পোড়া জমি। যুদ্ধ ফেরৎ কৃষক বাঙালি গফুর, আসফ, আলেফ, আমিন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যায়। মধ্যবিত্তের সঙ্গে নয় মাস কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করলেও– যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে নিম্নবর্গ পুনরায় উপলব্ধি করে মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাদের ভেদ রেখার স্বরূপ। আর উপলব্ধি করে বলেই আলেফ রাইফেলটা সরকারি দপ্তরে জমা না দিয়ে– ডোবার ভিতর ছুঁড়ে দেয়। "রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না"– প্রয়োজনের সময়।

১৯৮৯সালে প্রকাশিত হয় হাসানের ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ আমরা অপেক্ষা করছি। এই গ্রন্থের 'আমরা অপেক্ষা করছি' ও 'মাটির তলার মাটি' গল্প দুটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। প্রথমটির রচনাকাল ১৯৮১ এবং অন্যটির রচনাকাল ১৯৭৮ সাল। মুক্তি যুদ্ধের এক দশক দূর থেকে যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে হাসান অবলোকন করেন এই দুটি গল্পে। 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পে ফ্লাস ব্যাক পদ্ধতিতে স্মৃতির আশ্রয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এবং সে সময়ের চরম বামপন্থী সহিংস দল নিজ নিজ আদর্শসমেত মুখোমুখি। পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। উভয় শ্রেণীর সীমাবদ্ধতার দিক। হাসান আজিজুল হক উত্তেজনার ভঙ্গিতে চিহ্নিত করলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর অবদান ও ব্যর্থতা। বুর্জোয়া দলটি অস্ত্র দিয়ে কখনো পাকিস্তানকে মোকাবেলা করতে চায় নি; অথচ নিরস্ত্র জনসাধারণ বাধ্য হল অস্ত্রের মুখে পড়তে। অন্যদিকে চরম বামপন্থী গ্রুপটি জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। শ্রেণী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে করতে হাসান আসল সত্যটি বলে দিলেন প্রশ্নের আকারে নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা রুনুর গলায়– "একাত্তর সালে স্বাধীনতা কে এনেছিল তুই জানিস না? হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যুদ্ধ শেষ করে কি পেয়েছিল তা তোর জানা নেই? গত আট বছরে স্বাধীনতার ফলটা কারা চেটেপুটে খেলো তাও কি দেখতে পাস না" (পৃ. ২৫)।

'মাটির তলার মাটি' গল্পে মুক্তিযুদ্ধে উপলব্ধি ও অবদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তের একটি তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত বেশির ভাগ পালিয়ে বেড়ায়। নিম্নবর্গ নীরবে নিভৃতে আসল কর্মটির সঙ্গে যুক্ত থাকে। মুক্তিযুদ্ধে আবেগী মধ্যবিত্ত ভদ্রতা আর ভানের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিপরীতে নিম্নবর্গ অনেকটা নীরব, রুক্ষ এবং চিরায়ত সংকট মোকাবেলার মতই স্বাভাবিক। এরকম একটি চিত্রই আলোচ্য গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পের কথক মধ্যবিত্ত। যুদ্ধে যুক্ত না হয়ে পালাতে পালাতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ২০ জনের একটি দল নিয়ে আশ্রয় নেয় গ্রামের এক কৃষকের ঘরে। ষাট বছর বয়সের মজবুত শরীরের ক্ষুদে ক্ষুদে কটা চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন কৃষককে পেয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মধ্যবিত্ত লোকটির জিভ লকলকিয়ে ওঠে। কিন্তু চঞ্চল জিভ স্থির হয়ে পড়ে যখন জানা যায় বৃদ্ধ লোকটি মুক্তিযুদ্ধে তার বড় সন্তানকে হারিয়েছেন।

রোদে যাবো গ্রন্থে 'ঝড়' 'নবজাতক' ও 'নিশীথ ঘোটকী' গল্পগুলো অনেকটা সমসাদৃশ্য ভিত্তিক। তিনটি গল্পেই মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের বীভৎস রকম হত্যা, ধর্ষণ ও অত্যাচারের নির্মম-ছবি ভেসে উঠেছে। তিনটি গল্পকে মনে করা যেতে পারে, পীড়ন খচিত তিনটি জীবন্ত স্কেচ। তিনটি গল্পই সংক্ষিপ্ত।– অর্থাৎ আয়তনে ছোট এবং সাধুভাষায় রচিত হয়েছে 'নিশীথ ঘোটকী' গল্প- যা হাসানের ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রতুল।

'ঝড় গল্পটি যুদ্ধের শুরুতে গণহত্যা পরবর্তী ফাঁকা শহরের বিবরণ। নির্জনতা, একাকীত্ব ও ভীত বিহ্বল এবং নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর চলন্ত ছবির একটির পর একটি দৃশ্য মেলে ধরেছেন। গল্পের কথক এবং গল্পের শেষ ছবিটি নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর–

"কোথাও কোন শব্দ নেই। হাওয়া বন্ধ। ঘরভর্তি ঠাণ্ডা হলুদ রোদ। আমি ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। শ্যামলা রং-এর ছিপছিপে কিন্তু পুষ্ট দেহটি। এত তাজা, মনে হয় জ্যান্ত। আমি হয়তো তাই মনে করতাম যদি না দেখতাম দেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘন নীল রং-এর মোটা কাপড়টি ঘরের এক কোণে জড়ো করা। কালো চুলের গোছা মাথার পিছন দিকে ছড়ানো। মেয়েটির তরুণ শরীরে কোথাও কোনো খুঁত দেখতে পেলাম না। তার সারা শরীরে রোদ। শুধু একটি মাত্র খুঁত। মেয়েটির কোনো যোনি নেই। যোনির জায়গায় বিরাট একটি গহ্বর। সেই জায়গাটিতে রোদ যেতে পারেনি। কালো, ঘন কালো বিরাট গর্ত। অনেক গোলাপ বা অনেক পাথর চাপা দিয়েও গহ্বরটি বোজানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এটা কোনো কথাই নয়। সেই মেয়ের পুষ্ট স্তনদুটির একটি ছোট হাতের মুঠো দিয়ে টিপে ধরে অন্যটি চুষছে বছর খানেক বয়সের হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। ছোট ছোট হাত দিয়ে থাবড়া মারছে, মুখ ঘষছে, গরুর বাছুরের মতো ঢুঁ মারছে মাঝে মাঝে।" (পৃ.৪৫)।

'নবজাতক' গল্পটিও একটি বিবরণ। যুদ্ধের শেষ সময়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকসৈন্যদের তুমুল যুদ্ধে পালিয়ে বেড়ানো মানুষ ও পরিবেশের বিবরণ। শেষ ছবিটি একজন সন্তান সম্ভবা মায়ের। নয় মাসের বিপুল রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতার আগমন তাই প্রতিফলিত হয়েছে নবজাতকের প্রতীকে;

"চিৎকারটি দেবার পরেই সে কোঁকাতে শুরু করে, তার কপালের দুপাশের নীল শিরা আর গলার সবকটি রগ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সে একটানে তার

ভীষণ ময়লা শাড়িটি খুলে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমি তার সম্পূর্ণ উদোম চেহারা দেখার আগে সেই নিচু জায়গাটায় এক কলসি কাঁচা রক্ত দেখতে পেলাম। মেয়ে লোকটি রক্তের মধ্যে নিতম্ব ডুবিয়ে বসেছিলো। এবার সে ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে কোন রকমে বললো বাবা আমার সন্তান হবে– আমাকে বাঁচাও বাবা।" (পৃ. ৪৭)

'নিশীথ ঘোটকী' গল্প রাজাকারদের অত্যাচারের জীবন্ত ছবি। মুক্তি যোদ্ধার পিতা হওয়ার অপরাধে নৃশংসভাবে সর্বসমক্ষে রাজাকারদের হাতে এক বৃদ্ধের হত্যার ঘটনা প্রধান হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

মা-মেয়ের সংসার গ্রন্থের 'সম্মেলন" গল্পটি পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত এই গল্পে হাসান এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত সোনালী ফসল রূপান্তরিত হয়েছে শকুন ও পিশাচের ভৌগোলিক বস্তুতে। রূপকথার পিশাচদের মতোই আমাদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রাপ্তিকে চেটেপুটে খাচ্ছে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের একটি ছোট স্মৃতি আছে। অধ্যাপক আরেফ যখন 'তেরো বছরের কিশোর ছিলো', যখন ৭১ 'সাল,– ঢলঢলে কালো কাদায় জড়ানো দুর্ভেদ্য শর আর বেতের ঝোপে "তখন সে পুরো চোখ মেলে ড্যাবড্যাবিয়ে দেখতে থাকে একটা মানুষ, ন্যাংটো পচা আর ফোলা, অর্ধেকটা খাওয়া। একটা পা তো নিয়েই গেছে, খানিকটা দূরে মুঠো- খোলা ডান হাত, মাথাটা পাঁকের মধ্যে ডুবনোই বটে, শুধু পেটটা তার আকাশের সঙ্গে স্পর্ধা করে। পরের মুহূর্তেই মড়ার গন্ধ পটাপট শব্দে মগজের সঙ্গে সেলাই হতে থাকে মোটা একখণ্ড চাদরের মতো। মগজ পুরো ঢাকা পড়লে আর একটা ভাঁজ হয়ে সেলাই হয়। শেষে কোষের সঙ্গে কোষ মিশে যায় সারা জীবনের জন্য।" (পৃ. ১২)

আরেফের বালক বংশের এই মড়ার গন্ধের স্মৃতি তাকে অসুস্থ করে, অস্থির করে। এই গেঁথে যাওয়া স্মৃতির সূত্র ধরেই সেমিনারের পাশের আসনে বসা মোটা হ্যারিস টুইডের জ্যাকেট আর লাল টাই পরা ফর্সা লোকটির গা থেকে আরেফ একই ধরনের গন্ধ পায়। মড়ার গন্ধ পায় মঞ্চের সিংহাসনে উপবিষ্ট উপাচার্যের নিকট থেকে, গন্ধ পায় মঞ্চের ওপর যে 'চাঁদের হাট' বসেছে তা থেকে, এমনকি কিছুক্ষণ আগে যে মন্ত্রী এসেছিলেন তার নিকট থেকে, প্রবন্ধকারের নিকট থেকে। সমস্ত হল ঘরে বালক বয়সের মড়ার গন্ধ। উপাচার্য ঘাড় কাত করে মুর্গির রোস্টে কামড়

দেওয়ামাত্র আরেফ মড়ার গন্ধ পায়। এভাবেই গল্পকার বাংলাদেশে স্বাধীনতার সুবিধাভোগীদের রূপায়িত করেছেন। শুচীবায়ুগ্রস্থ অধ্যাপক আরেফের আশ্রয়ে হাসান আমাদের স্বাধীনতার সুফল লোপাটকারীদের চরম আঘাত হেনেছেন। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অথচ স্বাধীনতা উত্তর পরিস্থিতি নিয়ে এমন শক্তিশালী গল্প খুবই বিরল।

'হাসানের মুক্তিযুদ্ধের গল্প' এই কথাটিতে মূল উপজীব্য গল্প নয়– মুক্তিযুদ্ধ। কারণ ৭১ -এর সজীব বাস্তবতা যার অবয়ব তাকে গল্প না বলে মুক্তিযুদ্ধের আন্তরিক ইতিহাস বলতে স্বভাবতই লোভ হয়। "রক্তমাংসের মানুষের যে জীবন, জীবনের আবাসস্থল যে সমাজ, সেই সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আশা নিরাশা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি বিষয় একসূত্রে গ্রথিত করেন তিনি তার গল্পে। ... মাটি আর মানুষকে অনিবার্যভাবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে একটি বিশেষ চরিত্ররূপে চিহ্নিত করেন।"[৭] এই বিশেষ চরিত্র লেখকের কল্পনাজাত নয়– অভিজ্ঞতা জাত। হাসানের মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ একাত্তরে করতলে ছিন্নমাথা (১৯৯৫) গ্রন্থটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ সত্যের প্রমাণ মিলবে। যেমন–

"আমার জানা ছিল না যে পানিতে ভাসিয়ে দিলে পুরুষের লাশ চিৎ হয়ে ভাসে আর নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে। মৃত্যুর পরে পানিতে এদের মধ্যে এইটুকু তফাৎ। এই জ্ঞান আমি পাই '৭১ সালের মার্চ মাসের একেবারে শেষে- ত্রিশ বা ঊনত্রিশ তারিখে। ... অসংখ্য লাশ নেমে আসছে ভৈরবের স্রোত বেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নাচতে নাচতে এলো তারা– সংখ্যাহীন, বৈশিষ্ট্যহীন একাকার লাশ। ঢেউয়ের মাথায় তারা আছে, ঢেউয়ের নীচে তারা আছে, ঢেউয়ের ঢালু বেয়ে গড়িয়ে তারা নামছে খেলা প্রিয় জীবিতেরই মতো। পরস্পরে আটকে গিয়ে তারা জ্যামিতির নানা ছক বানাচ্ছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা বর্ণহীন তারা শুধুই লাশ মানুষের লাশ। নাচতে নাচতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে যাবে দক্ষিণে, তারা যাবে আরো দক্ষিণে বৈঠা দিয়ে তাদের গিজ গিজে হয়ে জমে থাকা স্তূপ সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে মাঝিরা, আবার এগিয়ে যাচ্ছে তারা দক্ষিণে, যাবে বলেশ্বরের স্রোতের মুখে হরিণঘাটার মোহনার দিকে। তারপরে বঙ্গোপসাগর।

সেই আমি প্রথম দেখলাম নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে , পুরুষের ভাসে চিৎ হয়ে। পৃ. ৯/১২)।

"সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র চুপ করে গেছে। দশই কি এগারোই ডিসেম্বর শিরোমনির যুদ্ধ শেষ। ...

মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জমছে গ্রামের মাঝখানে। স্কুলের মাঠে বা মসজিদ মন্দিরের উঠোনে। সেখান থেকে চলে আসছে হাটে গঞ্জে। আশ্বস্ত উদ্‌গ্রীব চেহারা তাদের। নয় মাসের নরকবাসের চিহ্ন তাদের শরীরে। যার কোথাও আঘাত লাগেনি। তারও ভিতরে একটানা যে আগুন জ্বলছে তাতেই পুড়ে কালো হয়ে গেছে তার শরীর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে তারা। জড়িয়ে ধরে পরখ করার চেষ্টা করছে, অন্যেরা বেঁচে কি না, নিজেরা বেঁচে আছে কি না, হাত বুলিয়ে দেখতে চাইছে রোদ সত্যি কি না, গাছপালা মাটির অস্তিত্ব, আছে কি না, শরীরে পানির

ছোঁয়া অনুভব করা যায় কি না। মানুষের উত্তাপে বাজারের জিনিস-পত্রগুলো পর্যন্ত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।" পৃ. ৭২)

এভাবে একাত্তর সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিসম্ভারে ভরে উঠেছে এ গ্রন্থ। আছে খুলনার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা খালেদ রশীদের কথা, শহীদ রফির কথা, ফুলতলার শান্তিদাসের কথা, আছে পাকবাহিনীর অত্যাচারের কথা, গণহত্যার কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা। ইন্ডিয়ান বোম্বিং বিমান, স্থল বাহিনী, যুদ্ধবিধ্বস্ত খুলনা, আছে যাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ তাদের কথা। সর্বোপরি বিজয়ের কথা। এইসব স্মৃতি এবং হাসানের মুক্তিযুদ্ধের গল্প– উভয়ের মধ্যে এক গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুইই আমাদের সংবেদনশীল আত্মার শিকড় ধরে টান দেয়। আমাদের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। কোনো কোনো গল্প আর স্মৃতি হুবহু মিলে যায়। যেমন 'মাটির তলার মাটি' এবং 'আটক' গল্পদুটির কাহিনী এবং এ গ্রন্থের দুটি লেখার মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাঁর গল্পগুলো এবং একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা পাঠক মনে একই বোধের সঞ্চার করে। বোধটি প্রাজ্ঞ ও সংবেদনশীল পাঠকের ভাষায় এই রকম :

"যখন রাজনৈতিকভাবে পরাধীন ছিল, তখনও ছিল অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন এই হতদরিদ্র মানুষগুলি, এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে একই রকম পরাধীন। মুক্তিযুদ্ধ, লেখকের ভাবালুতাবর্জিত দৃষ্টিতে, যেন আর এক পরাজয়ের কাহিনী।"[৮] পরাজয়ের অনুভব সঞ্চারিত হলেও যুদ্ধের উদ্বেলিত সমগ্র জাতির হৃৎপপিণ্ডের চলমান আওয়াজের সত্য ইতিহাসটি নিবেদিত হয়েছে গল্পে।

এই সত্য মেদহীন, আগাছাবর্জিত। বাস্তবতায় মগ্ন থেকে তিনি রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প- কিন্তু কেবল গল্প নয়, ইতিহাসও; সংখ্যা গণনার ইতিহাস নয়– তা ইতিহাসের অন্তঃসার। কলকাতার সুশীল সাহাকে লেখা এক চিঠিতে হাসান বলেছেন– "মুক্তিযুদ্ধের ওপর কয়েকটি গল্প আমি লিখেছি। খুব ভাল হয়নি। আমি সমস্ত ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। পুরোপুরি আমার গল্পে– হয়তো তা সম্ভবও নয়। আমি সেই কটি মাসের তেতো অশ্রুও আনতে পারিনি। এখন এমনই ঝরছে আরো তিক্ত আরো কটু, গভীর বেদনাময় চোখের জল। মুক্তি যুদ্ধের ওপর প্রকৃত গল্প লেখা হয়নি।'[৯]

হাসান বিনয়ী। মুক্তি যুদ্ধ তাঁর নিকট '৭১ এর মুক্তযুদ্ধের মতোই– বর্তমান প্রেক্ষাপটের মতো নয়। তাই তাঁর এই বিনয়। কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের গল্প রচনার ক্ষেত্রে হাসান এক বিস্তৃত পরিসর উন্মোচন করেছেন। এই পরিসরে নেই রোমান্টিকতা, ভাবালুতা ও কল্পনার কোনো আশ্রয়। এই পরিসর বাস্তব। তিক্ত, কটু, গভীর বেদনাময় চোখের জলের মতো এই বাস্তব। আর তাতে "স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্প, তবে সেই আন্দোলনের ধাক্কা বাংলাদেশের গ্রামের উপর কীভাবে পড়েছিল, তার উপর। চাষী তার ছেলের খোঁজে হাটে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যায়, কার গুলি, কোন গুলি সে জানতেও পারে না। স্বাধীনতার রাজনীতির গল্প নয়, নেতাদের অসহায়তা বা বীরত্ব নয়, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নয়। যাদের জন্য স্বাধীনতা তাদের গল্প।'[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, ভূমিকা, আবুল হাসানাত সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, (ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৩)

২. হাসান আজিজুল হক, 'বাংলাদেশ : পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়', অতলের আঁধি, (ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ৯০

৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯২.৯৩

৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চা* : তত্ত্ব ও পদ্ধতি, (ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ২০০), পৃ. ১২

৫. হাসান আজিজুল হক, 'বাংলাদেশ : পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৬. ইরাবান বসু রায়, 'হাসান আজিজুল হকের গল্পের ভুবন' রবিন ঘোষ সম্পাদিত বিজ্ঞাপন পর্ব, (হাসান আজিজুল হক সংখ্যা), কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৬৫), পৃ. ১৩২

৭. সরিফা সালোয়া ডিনা, 'হাসান আজিজুল হকের গল্প : মুক্তিযুদ্ধ ও মানুষ: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'উত্তরাধিকার' (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫।

৮. অশ্রুকুমার সিকদার, হাসান আজিজুল হকের 'নিজস্ব উপনিবেশ', *নবীন যদুর বংশ* (কলকাতা, ১৯৯১), পৃ. ১৫৫

৯. সুশীল সাহা, 'সেই সুরে বাজে মনে অকারণে" রবীন ঘোষ সম্পাদিত *বিজ্ঞাপন পর্ব* (হাসান আজিজুল হক সংখ্যা) (কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৫), পৃ. ১৬৭

১০. নিত্য প্রিয় ঘোষ চষাজমির আলের কোল প্রাগুক্ত। পৃ. ৯২।